



## **Pratidhwani the Echo**

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-XI, Issue-II, January 2023, Page No.01-07

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

### **সমাজসৃজনে শিক্ষার ভূমিকা: প্রেক্ষিত উপনিষদ**

**ডাঃ ব্রতী চক্রবর্তী**

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, তুর্কু হাঁসদা লাপসা হেরাম মহাবিদ্যালয়, মল্লারপুর, বীরভূম, ভারত

#### **Abstract:**

*Education plays a pivotal role in overall development of our society. If the social beings are educated in true sense, then the society would emerge as an elegant, later dynamic and progressive. If the scenario is opposed, then the society is destined to undergo destruction. The present society that is contaminated by corruption, viciousness, valuelessness, demands a discretion regarding education. Most of us in today's a world are highly educated, bagging various degrees. But the real education that make society beautiful and provide a backbone to the nation, is confined within the pages of books, it can't be noticed in our daily life. Was this type of education and such backboneless educated society expected by us?*

*Simplest answer to this question is 'No'. We never desire of education that fails to enhance intellect that makes people self-centered, valueless and unethical. Our earliest literature reminds us of this fact. Upanishads, considered to be the essence of Vedas, contain many guidelines for creating an ideal society. The Upanishads appear to be about self-realization, but if we dig deep into their verses, we will find that they encourage a praiseworthy lifestyle. The suggestions that are prevalent in all verses of the Upanishads help in the upliftment of the society as a whole. The relationship and duties of 'Guru' and 'Shishya', the topic and pedagogy of the education system, all are demonstrated in Upanishads.*

*It is our duty to follow the path shown by the Rishis to lead ourselves in assimilation of education and thus create a modern and well-educated society. Being modern does not necessarily mean to wave aside the age-old conventions, but to consume whatever good there is in those conventions and prosper.*

**Keyword: Society, Role of education, Upanishads, lifestyle, Guru, Shishya, Duties, Teaching Methods, Syllabus.**

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একদল মানুষ যখন কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত ও সজ্জবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে আমরা সমাজ বলে থাকি। নিজের প্রয়োজনে মানুষ নিজেই সমাজ গড়ে। এই সমাজসৃজনের তাগিদ সভ্যতার আদিলগ্ন থেকে মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। গৃহবাসী মানুষ

নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদে, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে জয় করার জন্য, নিজেদের জীবনধারণের জন্য দলবদ্ধ হয়েছিল। সেদিনের সেই দল বা গোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা। কিন্তু বর্তমানে সমাজসৃজনের মূল উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন। সমাজের মধ্যে সামাজিকদের মৌলিক চাহিদাগুলি যে শুধু পূরণ হয় তাই নয়, তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলি লালিত পালিত ও পল্লবিত হয় এই সমাজেই। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণগুলি বিকশিত হয়ে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব এই সমাজের প্রাপ্তগেই। তাই এমন এক সমাজ সর্বদা কাম্য যেখানে মানবিক সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। এই সুস্বাস্থকর সমাজ তৈরি করতে পারে কেবলমাত্র সুশিক্ষা। কোন সমাজের তথা সামাজিকের সর্বাঙ্গীন বিকাশে শিক্ষার মাহাত্ম্য অপরিসীম। সামাজিকেরা যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত হন তাহলে সেই সমাজ হবে রুচিশীল, প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ। কিন্তু এর বিপরীত হলে সমাজের অবক্ষয় নিশ্চিত। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে, যখন চারিদিকে দুর্নীতি, অনৈতিকতা, মূল্যবোধহীনতা সমাজকে কলুষিত করছে। আজ আমরা অনেকেই উচ্চশিক্ষিত, নানান ডিগ্রিধারী। Age of Information এর বর্তমান যুগে শিক্ষার্থীর মাথা তথ্যবোঝাই হচ্ছে, নামের পাশে জুড়ছে নানান উপাধি, কিন্তু যে শিক্ষা একটি সমাজকে সুন্দর করে তোলে, একে অপরের জন্য ভাবতে শেখায়, সর্বোপরি একটি জাতিকে মেরুদণ্ডী করে তোলে, সেই শিক্ষা যেন শুধু বই এর পাতাতেই থেকে যাচ্ছে, জীবনচর্যায় সেই শিক্ষার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। ছোটবেলায় পড়েছি, ‘সদা সত্যকথা বলিও, কখনও মিথ্যা কথা বলিও না’। বাস্তবে চতুর্দিকে মিথ্যার জয়জয়কার। গল্পের মাধ্যমে শিখেছি, ‘একতাই পরম বল’, ‘দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন’ ইত্যাদি বহু নীতিকথা। কিন্তু বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা বিপরীতধর্মী। এই ধরণের শিক্ষাব্যাবস্থা ও সেই শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজই কি আমাদের কাজিত ছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর— ‘না’, এমন সমাজ ও এমন শিক্ষা কোনটিই কাজিত নয়। যে শিক্ষা শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটায় না, যে শিক্ষা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে, ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধহীন করে তোলে সে শিক্ষা কখনই কাজিত হতে পারে না। তাহলে কিভাবে এই সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব? সেই পথের সন্ধান মেলে আমাদেরই প্রাচীনতম সাহিত্যে। বৈদিক সাহিত্যের অন্তিম ভাগ উপনিষদ। এখানে প্রযুক্ত ‘অস্তিম’ শব্দটি যে কেবলমাত্র শেষার্থে পর্যবসিত নয় সেটি সবার জানা। এখানে অন্ত মানে সার, শ্রেষ্ঠ বা চরম। ক্রান্তদর্শী ঋষিদের কর্মজিজ্ঞাসার আত্ম বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় উত্তরণ ঘটেছে বেদের এই জ্ঞানকাণ্ডে। বৈদিক সাহিত্যের সারাৎসার উপনিষদের দ্বারস্থ হলে আমরা সন্ধান পাব সেই শিক্ষার যা মানুষকে শ্রেয়ের পথ দেখায়, আত্মিক উন্নয়ন ঘটায়। অনেকের মতে উপনিষদ কেবল সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের উপজীব্য। যেহেতু উপনিষদ আত্মসাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মুক্তির পথপ্রদর্শন করে তাই তা মানুষকে সংসারবিমুখ করে বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু এই ধারণা সর্বাংশে ভুল। উপনিষদের মূল বিষয় আত্মতত্ত্ব হলেও মন্ত্রসমূহ গভীরভাবে মনন করলে বোঝা যায়, উপনিষদ জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের উপদেশ দেয়। যেভাবে চললে নিজের ও অন্যের মঙ্গল হবে, সুন্দর সমাজের রচনা হবে, সেই সমস্তই বিন্যস্ত রয়েছে উপনিষদের আঙিনায়। প্রয়োজন শুধু সেগুলিকে আহরণ করে নিজের জীবনচর্যায় সেই শিক্ষাকে প্রয়োগ করা। বর্তমান নিবন্ধে উপনিষদে প্রতিফলিত শিক্ষার প্রকৃতি আমরা আলোচনা করব, যা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের অনুকূল।

‘উপনিষদ’ নামটির মধ্যের নিহীত রয়েছে উপনিষদের শিক্ষাপদ্ধতির ইঙ্গিত। উপ পূর্বক নি পূর্বক সদ ধাতুর সাথে ক্রিপ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে তৈরী হয়েছে উপনিষদ পদটি। উপ ও নি উপসর্গের অর্থ যথাক্রমে সামীপ্য ও নিশ্চয়। সদ ধাতুর বহুবচন অর্থের<sup>1</sup> মধ্যে গতি বা প্রাপ্তি অন্যতম। শিষ্য বিনীতভাবে গুরুসমীপে

উপবেশন করে নিশ্চিতরূপে জ্ঞানলাভ করে বলেই এর নাম উপনিষদ। যেকোন বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হতে গেলে, বিষয়টিকে আত্মস্থ করতে হলে অভিজ্ঞ আচার্যের সান্নিধ্য ও চিত্তচাঞ্চল্যকর বিষয় থেকে দূরত্ব একান্ত প্রয়োজন। উপনিষদ আমাদের সেই দিক্‌দর্শন করায়। জীবনের যে স্তরে নতুনকে গ্রহণের ক্ষমতা সর্বাধিক, যখন বুদ্ধির উপর মিথ্যার আবরণ পড়ে না, মন হয় কালিমামুক্ত, সেই শৈশব ও কৌমার্যকালকেই বিদ্যার্জনের কালরূপে চিহ্নিত করেছে উপনিষদ। নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্রহ্মচর্য'। বর্তমান সময়ে যেমন পাঁচ বছর বা তার আগেই শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় উপনিষদেও পঞ্চবর্ষীয় বালকের ব্রহ্মচর্যে প্রবেশের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাহলে মনে হতে পারে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সাথে উপনিষদীয় শিক্ষাব্যবস্থার পার্থক্য কোথায়? বর্তমানে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যায়, পড়াশোনা করে, আবার তার নিজের পরিমণ্ডলে ফিরে এসে অভ্যস্ত জীবনযাপন করে। কিন্তু উপনিষদের শিক্ষা আবাসিক। পঞ্চবর্ষীয় বালকটিকে সঁপে দেওয়া হত গুরুর হাতে দীর্ঘ দশ-বারো বছরের জন্য। রাজার সন্তান হোক বা ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত বা সাধারণ গৃহস্থের সন্তান, গুরুগৃহে গিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করতে হত সকলকেই। হত তাদের উপনয়ন। 'উপ' অর্থাৎ সমীপে 'নয়ন' অর্থাৎ আনয়ন। শিক্ষার্থীর সকল দায়িত্ব এর পর গুরুর। ব্রহ্মবিদ গুরুর একান্ত সান্নিধ্যে শিষ্য কেবলমাত্র বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নে নিজেকে মগ্ন রাখত না, অধিকন্তু গুরুর ব্যক্তিত্বের ও জীবনচর্যার প্রভাব পড়ত তার জীবনে। গুরুগৃহে বাস করে ছাত্র জীবন ও চরিত্র গঠনে সক্ষম হত, আদর্শ শিক্ষকের অনুসরণে। বেদপাঠের পাশাপাশি বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করতে হত। যেমন- সমিধ আহরণ, পশুচারণ, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ প্রভৃতি। এর ফলে তাদের পরবর্তী বাস্তব জীবনের সাথে পরিচয় ঘটত। ভিক্ষান্নের দ্বারা জীবনধারণের ফলে ক্ষুধানিবৃত্তির পীড়া সম্পর্কে তারা যেমন অবহিত হত, তেমনি অন্নের মাহাত্ম্যও তারা অনুভব করত। সকলের সাথে সহাবস্থানের ফলে তাদের মানবিক গুণগুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেত। বাহুল্যকে বর্জন করে পরিমিত জীবনযাপনের শিক্ষা দেয় উপনিষদীয় ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ফলে ছাত্র হয় সংযমী, নিরহংকারী। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় চতুর্দিকে প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি। নামি স্কুল, দামি পোষাক, অতিযত্নশীল অভিভাবক, শিক্ষার উপকরণের প্রাচুর্য ইত্যাদির মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যার্জন নিজের গতিতে চলছে, কিন্তু সমস্তকিছুর আতিশয্যে শিশুমনের কোমনীয়তা, তার সুকুমার বৃত্তিগুলি কোথাও যেন হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ফিরে যাওয়া সম্ভব না হলেও শিশুর ও সমাজের মঙ্গলার্থে সেই সরল, অনারম্বর জীবনযাপনের শিক্ষা আমরা উপনিষদ থেকে নিতেই পারি।

সুশিক্ষার প্রয়োগ সার্থক হবে কি না তা অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষার্থীর উপর। পাত্র ক্রটিপূর্ণ হলে তাতে যত উত্তম মানের জলই রাখা হোক না কেন তা নিঃসৃত হবেই। তাই আধার ক্রটিমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। উপনিষদে তাই শিষ্যের যোগ্যতা বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। সেকালেও পাণ্ডিত্যাভিমानी ছাত্রের অভাব ছিল না। সেই উদাহরণ আমরা পাই ছান্দোগ্যোপনিষদে উদালকপুত্র শ্বেতকেতুর আচরণে।<sup>2</sup> প্রায় বারো বছর বয়স্ক বিদ্যাবিমুখ শ্বেতকেতুর বিদ্যার্জন বিষয়ে চিন্তিত পিতা উদালকের স্নেহপূর্ণ ভর্তসনায় শ্বেতকেতু গুরুগৃহে যায় বিদ্যালভের জন্য। বারো বছর বিদ্যাচর্চা করে যখন সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তখন পিতা দেখেন পুত্রের আচরণে নেতিবাচক পরিবর্তন।<sup>3</sup> শিক্ষা তাকে দাস্তিক ও পাণ্ডিত্যাভিমानी করে তুলেছে। প্রকৃত শিক্ষা, যা মানুষকে মানবিক করে তোলে সেটি সে লাভ করেনি। পিতার ইচ্ছায় সে গুরুগৃহে গিয়েছিল, অজানাকে জানার ইচ্ছা তার সহজাত নয়। তাই সমস্ত কিছু অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও সে প্রকৃত শিক্ষার শিক্ষিত হতে পারে নি। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি জিজ্ঞাসু মন। এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপনিষদের ঋষি বোঝাতে চেয়েছেন জানার ইচ্ছা যদি স্বাভাবিক হয় তবেই সেই জ্ঞান হবে ইতিবাচক।

যেমনটি ঘটেছিল সত্যকামের ক্ষেত্রে। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখা যায় গুরু গৌতমের কাছে সত্যকাম বিদ্যা অর্জনের জন্য গেলে তিনি তাকে চারশ গাভীর দায়িত্বভার দিয়ে প্রবাসে পাঠান শিক্ষালাভের জন্য। সত্যকাম তৎক্ষণাতঃ গুরুর আদেশ মতো আশ্রম থেকে বহুদূরে গভীর অরণ্যে চলে যান এই প্রতিজ্ঞা করে- ‘নাসহস্রৈণাবর্তেয়’<sup>4</sup> অর্থাৎ যতদিনে এই চারশ গরু সহস্র সংখ্যায় পরিণত না হচ্ছে ততদিন সে ফিরবে না। অরণ্যে দিনযাপন কালে মনুষ্যেতর ও প্রকৃতি থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। সে যখন সহস্র গরু নিয়ে ফিরে আসে তখন গৌতম তাকে দেখে তার মধ্যে জ্ঞানের দীপ্তিকে অনুভব করেন।<sup>5</sup> এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জিজ্ঞাসু মন নিয়ে স্বেচ্ছায় বিদ্যালাবে আগ্রহী হয় তাহলে জ্ঞান নিজেই তার কাছে নিজেকে উন্মোচিত করে, সেক্ষেত্রে কোন উপকরণের অভাব তার শেখার পথে বাধা দিতে পারে না। উপনিষদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে আমাদের উচিত ছাত্রদের উপর কোনকিছু আরোপ না করে তার মনে জিজ্ঞাসা সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা।

উপনিষদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল শিষ্যের সার্বিক উন্নতি সাধন। তাই জ্ঞানচর্চার সাথে নৈতিক শিক্ষাদানও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপনিষদ বলে— ‘মা গৃধঃ কস্যস্বিদ ধনম্’<sup>6</sup> পরের জিনিসে লোভবশতঃ গ্রহণ না করার উপদেশ দিয়েছে উপনিষদ। কারণ কামনা, লোভ এগুলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, ভোগের মাধ্যমে এদের কখনও তৃপ্ত করা যায় না, ত্যাগই এগুলি প্রসমনের একমাত্র উপায়। তাই ত্যাগের মাধ্যমে ভোগের কথা বলা হয়েছে— ‘তেন ত্যজেন ভুঞ্জীথা’। যে ভোগে অপরের স্বার্থহানি না হয়, সেই ভোগই কাম্য। তার জন্য প্রয়োজন সংযমশিক্ষা। নিজেকে সংযত করে অপরের স্বার্থের প্রতি খেয়াল রাখা একজন সুস্থ সামাজিকের অন্যতম গুণ। এর দ্বারা প্রশমিত হয় পরস্পরের প্রতি বৈরিতা ও বিদ্বেষ মনোভাব। জাগরিত হয় মৈত্রীর বাতাবরণ, যা সুস্থ সমাজসৃজনের অপরিহার্য উপাদান। উপনিষদ শেখায় শ্রেয়-প্রেয়ের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়। প্রেয় হল আপাতমধুর, যা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে কিন্তু পরিণামে অকল্যানকর। আর যা চিত্তাকর্ষক না হলেও কল্যানকর তা শ্রেয়। জীবনে চলার পথে উভয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। কোনটিকে বর্জন করে কোনটিকে গ্রহণ করা কর্তব্য সেটি বিচার্য। উপনিষদে সেই বিচারবুদ্ধির সন্ধানও পাওয়া যায়। উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে বহু কাহিনী যেখানে এই শ্রেয়-প্রেয় এর দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। যেমন— বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য যখন মৈত্রেয়ীকে তার সম্পত্তির ভাগ দিতে আগ্রহী তখন মৈত্রেয়ী বলেছেন— ‘যেনাহং নামৃতা স্যাৎ কিমহং তেন কুর্যাম্’<sup>7</sup> যা আমাকে অমৃতের আশ্বাদ দেবে না তা নিয়ে আমি কি করব? এই বলে প্রেয়কে ত্যাগ করে শ্রেয় আত্মজ্ঞান চেয়েছেন স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে। কঠোপনিষদের দেখা যায় বালক নচিকেতার শ্রেয়লাভের দৃঢ়প্রত্যয়। পিতা উদালক দ্বারা যমের প্রতি দত্ত নচিকেতা পিতার কথার মর্যাদা রক্ষার্থে যমসদনে পাড়ি দেয়। সেখানে তিন দিন ও তিন রাত্রি অপেক্ষা করার জন্য যম তিনটি বর দিতে চান নচিকেতাকে। নচিকেতাও বররূপে চেয়ে নেয় তার প্রতি পিতার ক্রোধের উপশম, স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ অগ্নিবিদ্যা এবং আত্মতত্ত্ব ও তা লাভের উপায়। প্রথম দুটি বর যম বিনা প্রশ্নে মেনে নিলেও তৃতীয়টির ক্ষেত্রে তিনি সহজে রাজি হন নি। আদেও নচিকেতা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী কিনা তা পরীক্ষার জন্য নচিকেতাকে জাগতিক ও স্বর্গীয় বিষয়ের প্রলোভন দেখান। নচিকেতা কিন্তু আপাতমধুর এই সমস্ত প্রেয়বস্তুকে ত্যাগ করে শ্রেয়লাভের দিকে অগ্রসর হল। নচিকেতা জানায়—

‘ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিভ্রমদ্রাম্ম চেৎ ত্বা।  
জীবিস্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্ত মে বরণীয়ঃ স এবা।’<sup>8</sup>

শ্রেয় ও প্রেয়ের এই দ্বন্দ্ব সর্বদা মানুষের সামনে উপস্থিত হবে, সেই বুদ্ধিমান যে প্রেয়কে ত্যাগ করে শ্রেয়ের পথ অনুসরণ করবে— নচিকেতার এই বিচার শাস্ত, সর্বকালে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান সময়ে আমরা এমন অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হই যেখানে একদিকে থাকে প্রেয়ের হাতছানি আর অন্যদিকে থাকে শ্রেয়মার্গ। আমরা অনেকেই সহজলভ্য প্রেয়ের পথকে বেছে নিয়ে পরবর্তীতে বিপদের সম্মুখীন হই। সমাজের সমস্তরকম অবক্ষয়ের জন্য দায়ী এই বিচারবুদ্ধির অভাব। সমাজের মঙ্গলার্থে সহজলভ্য পরিণামে ক্ষতিকর পথ ত্যাগ করে আপাতকঠোর কিন্তু মঙ্গলময় পথচয়নের শিক্ষা ছাত্রাবস্থা থেকেই দেওয়া উচিত, যা উপনিষদে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে।

মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবহেলা আধুনিক সমাজের এক কদর্য দিক। যে পিতামাতা তাদের জীবনের সর্বস্ব দিয়ে সন্তানদের মানুষ করেছে, সমাজের উচ্চাসনে বসার যোগ্য করে তুলেছে সেই মাতাপিতার স্থান হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে, সইতে হচ্ছে অসহনীয় অবহেলা, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। শিক্ষকদের সাথেও গড়ে উঠছে না আত্মিক বন্ধন। সমাজের চতুর্দিকে শুধু চাওয়া-পাওয়া, লাভ-ক্ষতির হিসাব। এই যে ন্যায় অন্যায়ের শিক্ষার অভাব বর্তমান সমাজে প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে, উপনিষদীয় শিক্ষাব্যবস্থায় কিন্তু সেই মানবিক শিক্ষার অভাব ছিল না। মাতা পিতা আচার্যদের দেবতার আসনে আধিষ্ঠিত করা হয়েছে সেখানে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে— ‘...মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেব ভব’।<sup>9</sup> বিদ্যাশেষে শিষ্যের প্রতি এই ছিল গুরুর উপদেশ। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে কথাগুলি উচ্চারিত হয়, কিন্তু জীবনে আচরিত হয় খুব কম ক্ষেত্রেই। উপনিষদীয়যুগে কিন্তু এগুলি আচরিতও হতে দেখা যায়। পিতার কথার মান রাখার জন্য নচিকেতা স্বেচ্ছায় যমসদনে পাড়ি দেয়, মায়ের কথাকে বিনাপ্রশ্নে মেনে নিয়ে গৌতমের কাছে সত্যকাম নিজের পরিচয় দেয় জবালাপুত্র জাবাল সত্যকাম হিসাবে, গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে সত্যকাম অনির্দিষ্টকালের জন্য চলে যায় গহন অরণ্যবাসে। উপনিষদের হত্রে হত্রে পিতা মাতা গুরুজনে শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত উপলব্ধ। এখন আমাদের কর্তব্য সেই সমস্ত উক্তিকে কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়রূপে না রেখে নিজেদের আচরণে সেই মহান বাক্যগুলিকে বাস্তবায়িত করা, যাতে ভবিষ্যৎপ্রজন্মের মধ্যে এই আচরণ সহজাত হয়ে ওঠে।

সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়। শিক্ষক হলেন সেই কারিগর, যিনি পথের প্রান্তে পড়ে থাকা একখণ্ড মৃত্তিকাপিণ্ডকে ব্যবহারোপযোগি পাত্রে পরিণত করতে পারে। কোমলমতি শিশুদের মানুষরূপে গড়ে তোলার কারিগর শিক্ষক। কেমন হবেন শিক্ষক? কী হবে তাঁর কর্তব্য? উত্তর পাওয়া যাবে উপনিষদেই। উপনিষদে বর্ণিত শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য, কর্তব্য আলোচনার আগে নামটির তাৎপর্য দেখে নেওয়া যাক। বর্তমানের শিক্ষক উপনিষদে গুরুরূপে পরিচিত, যদিও উভয়ের ভূমিকা সর্বাংশে এক নয়, তবুও বিদ্যাদাতারূপে এখানে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। উপনিষদীয় শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুর প্রাধান্য সর্বাত্মক। ‘গৃণাতি উপদিশতি ধর্মং গিরত্যজ্ঞানং বা’ অর্থাৎ যিনি ধর্মের উপদেশের মাধ্যমে অজ্ঞানকে তিরোহিত করেন তিনিই ‘গুরু’। আগমসার গ্রন্থে গুরু পদের বর্ণবিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

‘গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তোরৈফঃ পাপস্য দাহকঃ।

উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তপ্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ।।

গকারোজ্ঞানসম্পতৈরেফস্তত্ত্বপ্রকাশকঃ।

উকারাৎ শিবতাদাত্ৰং দদ্যাতি গুরুঃ স্মৃতঃ।।<sup>10</sup>

যিনি সিদ্ধিদাতা, পাপনাশক্ষম এবং মঙ্গলকামী তিনিই গুরু। যিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশের মাধ্যমে শিবের সাথে নিজের অভেদজ্ঞান করান তিনিই গুরু। নামের দ্বারাই শিষ্যের জীবনে গুরুর ভূমিকা প্রতীত হচ্ছে। শিষ্যের অন্তরে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে তাকে আলোর রাজ্যে প্রবেশের পথ দেখান গুরু। তাই ব্রহ্মচারী ‘সমিৎপাণী’ হয়ে গুরুর কাছে যায় বিদ্যালভের জন্য। সমিধ্ বা ইন্ধন অগ্নিপ্রজ্জ্বলনে ব্যবহৃত হয়। গুরু শিষ্যের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন বলেই এই শিষ্টাচারের অবতারণা। গুরুগৃহে অবস্থানরত ছাত্রকে পুত্রজ্ঞানে পালন করতেন গুরু। শিষ্যরাও গুরুকে পিতার মতই দেখত। একই সাথে চলত তাদের জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া, অন্ধকার থেকে আলোর জগতে যাওয়া, অসৎ থেকে সৎস্বরূপে অবগাহন। গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক তাদের প্রার্থনাতেই ধ্বনিত হত—

‘ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনজু, সহ বীর্যং করবাবহৈ  
তেজস্বী নাবধীত্বাস্ত, মা বিদ্বিষাবহৈ।।<sup>11</sup>’

গুরুশিষ্যকণ্ঠে একইসাথে শোনা গেছে সমতার এই বাণী। এর থেকে আর একটি দিকেও নজর পড়ে। শিষ্যশিক্ষার সময় গুরুর জ্ঞান অর্জন সমাপ্ত হয়ে যায় না, জানার পরিধি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। আধুনিকযুগের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য।

গুরু যে কেবলমাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই হবেন সেই কথা বলে না উপনিষদ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজা, সাধারণ গৃহস্থ, পিতা, স্বামী প্রভৃতি অনেকেই গুরুরূপে বিবেচিত হতে পারে। এমনকি মনুষ্যতরের কাছেও শিক্ষালাভের নিদর্শনও পাওয়া যায় উপনিষদে। বৃহদারণ্যকে আত্মজিজ্ঞাসু মৈত্রেয়ীর জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করেছে তার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য, তৈত্তিরীয়তে পিতা বরুণ ভৃগুকে উপদেশ দিয়েছেন, কঠোপনিষদে গুরুরূপে উপস্থিত স্বয়ং যম। বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে নির্দিষ্ট কারো কাছ থেকেই জ্ঞানলাভ করা যাবে এমন নয়, জীবনকে সুপথে পরিচালিত করার শিক্ষা যেস্থান থেকেই পাওয়া যাক না কেন তা সর্বদা গ্রহণীয়। ছাত্রের জীবনে শিক্ষকের ভূমিকাও সুন্দর গল্পের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে উপনিষদে। জ্ঞানারণ্যে গুরু প্রদীপতুল্য। গুরু শিষ্যকে জানতে সহায়তা করবেন, তার জানার পথের বাধাগুলিকে সরিয়ে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে দেবেন। জানতে হবে শিষ্যকে নিজেই। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্দশ খণ্ডে আরুণি শ্বেতকেতুর দৃষ্টান্তে জ্ঞান অর্জনে গুরুর ভূমিকা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরুণি বলেছেন— গান্ধার দেশের কোন এক ব্যক্তিকে চোখ বেঁধে দুষ্কৃতির লোকশূন্য অরণ্যে এনে পরিত্যাগ করে, তখন সেই ব্যক্তি দিকভ্রান্তের মত অনুভব করে। সেই সময় কোন এক করুণাময় পুরুষ এসে তাকে বন্ধনমুক্ত করে উপদেশ দেয়— ‘এতাং দিশাং গান্ধারা এতাং দিশাং ব্রজেতি’। এইভাবে দিক দর্শিত হলে সেই ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নিজের দেশে উপনীত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুর ভূমিকা সেই করুণাময় পুরুষ সদৃশ। অজ্ঞানাচ্ছন্ন শিষ্যের চোখের আবরণ সরিয়ে দিয়ে তাকে শিক্ষালাভের উপযুক্ত করে তোলা গুরুর কর্তব্য। শিখতে হবে শিষ্যকে নিজেই। গুরুর মুখোচ্চারিত উপদেশ শ্রবণ করে বিচারপূর্বক মননের পর বিষয়টিকে আত্মস্থ করা শিষ্যের কাজ। গুরু তাকে কিভাবে শিখতে হয়, জানতে হয় সেই পথের সন্ধান দেবেন। এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে ছাত্রকেই। নিজে শিখলে তবেই সেই জ্ঞানকে জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে সে, নাহলে শিক্ষালাভ গলাদ্বকরণ ও উদীরণে পরিণত হবে।

উপনিষদের ছত্রে ছত্রে রয়েছে আদর্শ মানুষ হওয়ার শিক্ষা। এই নিবন্ধে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো কিছু অংশের অলোচনার মাধ্যমে উপনিষদীয় শিক্ষার কিছু নমুনা প্রদর্শিত হল। ইতিহাসের সাল তারিখের

বিচারে উপনিষদের কাল বহুপূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেলেও উপনিষদীয় শিক্ষা আধুনিক সময়ের নিরীখেও এখনও সমভাবে প্রাসঙ্গিক। আমাদের কর্তব্য ঋষিপ্রদর্শিত পথে নিজেদের পরিচালিত করে আগামী প্রজন্মকে উন্নতমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, যাতে এক সুস্থ, স্বাভাবিক, সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠে। আধুনিকতা শুধু পুরোনোকে বিসর্জন দেওয়াতে নয়; পুরোনো যা কিছু শুভ, কল্যানকর সেই সমস্তকে পাথেয় করে এগিয়ে চলাতে।

### তথ্যসূত্র:

1. শঙ্করাচার্য কঠোপনিষদের ভাষ্যভূমিকায় সদ ধাতুর তিনটি অর্থ নির্দেশ করেছেন- বিশরণ, গতি ও অবসাদন - 'সদের্ধাতোর্কির্বিশরণগত্যবসাদনার্থস্য উপনির্ধ্বস্য কিপ্ প্রত্য্যান্তস্য রূপমিদং উপনিষদ্ ইতি'।
2. দ্রষ্টব্য 'আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদ', ছান্দোগ্যোপনিষদ (৬/১)
3. 'স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতি বর্ষঃ সর্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনুচানমানী স্তম্ভ এয়ায়'- ছান্দোগ্যোপনিষদ, (৬/১/২)।
4. দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্যোপনিষদ, (৪/৪/৫)।
5. 'ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি'- ছান্দোগ্যোপনিষদ (৪/৯/২)।
6. দ্রষ্টব্য ঈশোপনিষদ (১)।
7. দ্রষ্টব্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ (২/৪/৩)।
8. কঠোপনিষদ (১/১/২৭)।
9. তৈত্তিরীয় উপনিষদ (১/১১/২)।
10. দ্রষ্টব্য বাংলা বিশ্বকোষ, খণ্ড ৫, পৃ ৪৩৮।
11. অর্থাৎ আমাদের উভয়কে (আচার্য ও শিষ্য) ব্রহ্ম তুল্যভাবে রক্ষা করুন, ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে বিদ্যাফল যেন তুল্যভাবে ভোগ করান, আমরা উভয়ে যেন সমানভাবে বিদ্যালান্ভের উপযুক্ত বিদ্যা-সামর্থ্য অর্জন করতে পারি, আমাদের অধ্যয়ন বীর্যশালী হোক, আমরা যেন পরস্পরকে বিদেষ না করি।- কঠোপনিষদ শান্তিপাঠ।

### গ্রন্থপঞ্জী:

1. উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ)- অতুলচন্দ্র সেন (সম্পাদক), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০।
2. কঠোপনিষৎ - সীতানাথ গোস্বামী (অনুবাদক), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০২।
3. ছান্দোগ্যোপনিষদ - দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (সম্পাদক, অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা), ১ম ও ২য় ভাগ, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০১৪।
4. তৈত্তিরীয়োপনিষদ (সমগ্র)- দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (সম্পাদক, অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা), দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০৮।
5. বসু, নাগেন্দ্রনাথ (সম্পাদক) - বাংলা বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লী, ১৯৮৮।
6. মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল - উপনিষদের অমৃত, শ্রী সারদা মঠ, কলকাতা, ২০১৩।